বেঙ্গল টাইমস

বইমেলা সংখ্যা

KOLKATA BOOK FAIR
BUY BOOKS WIN LIBRARY
BUMPER LOTTERY

বইয়ের মহাসমুদ্রে

ISSN 2445 5657
bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস

বইমেলা সংখ্যা ২০২৪

সূচিপত্র

অযোধ্যা নয়, দাদু–নাতিতে বইমেলায়

❑ সুরঞ্জন পাত্র

পড়া আর শোনা দিব্যি মিশে গেছে

❑ মলয় সেন

আমার ঠিকানা ওই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন

❑ সুকর্ণ সিনহা

গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল

❑ পারিজাত সেন

ভাগ্যিস বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারেন না

❑ সরল বিশ্বাস

ধন্যবাদ লকডাউন, বই পড়ার অভ্যেস ফিরিয়ে দিলে

❑ নিখিল সেন

জয় গোস্বামীর থেকে ঋতুপর্ণার কদর বেশি!

❑ রাহুল বিশ্বাস

আ কেসস্টাডি অন বাংলা বই বিপণন

❑ অর্ণব চ্যাটার্জি

বইমেলা বললে সেই ময়দানকেই মনে পড়ে

❑ অরিত্র ঘোষাল

ফিরে এসো, ময়দান

❑ স্বরূপ গোস্বামী

লেখক কিন্তু নজর রাখছেন

❑ উত্তম জানা

সামাজিক উপন্যাসে পাঠক
উদাসীন কেন?

❑ নীলাদ্রি গুপ্ত

নন্দ ঘোষের কড়চা
পথে এসো বাবাজীবন

স্মৃতিটুকু থাক

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সেল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন ৯৮৩১২২৭২০১।

ওয়েবসাইট bengaltimes.in ISSN 2445 5657

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

এই মশাল জ্বলতেই থাকুক

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। চারিদিকে যে হারে মেলার হিড়িক, এখন আর সংখ্যাটাকে তেরতে বেঁধে রাখা যাবে না। শীরদোৎসব বা দীপাপলির কথা ছেড়ে দিন। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু তার বাইরে সামাজিক উৎসব! নিশ্চিতভাবে বাকি সব উৎসবকে দশ গোল দেবে বইমেলা। আন্তর্জাতিক আসরে বাঙালি যে কয়েকটি ব্যাপারে গর্ব করতে পারে, বইমেলা নিশ্চিতভাবে সামনের সারিতে থাকবে। বারোদিন ধরে এত মানুষের সমাগম, এত বইয়ের ক্রয়-বিক্রয় বিশ্বের কটা শহরে হয়?

দীর্ঘদিন বইমেলা হয়ে এসেছে ময়দান চত্বরে। অনেকের কাছে বইমেলা আর ময়দান যেন সমার্থক হয়ে আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঠিকানাই বদলে যায়। করুণাময়ী চত্বরে বইমেলা পেয়েছে তার স্থায়ী ঠিকানা। জায়গাটা হয়ত একটু ছোট। কিন্তু যোগাযোগের দিক থেকে যতটা দুর্গম ছিল, এখন আর ততখানি দুর্গম বলা যাবে না। নানা দিকের বাস, অটো যেমন আছে, তেমনই নতুন সংযোজন মেট্রো। শিয়ালদার সঙ্গে

জুড়ে গেছে। হাওড়ার সঙ্গে জুড়ে গেলে আসা–যাওয়া আরও মসৃণ হতে পারে। তখন কলকাতা বইমেলা আর নিছক কলকাতার থাকবে না। শহরতলিও আবার সামিল হবে।

এখন অনলাইন ডেলিভারিতে ঘরে বসেই বই পাওয়া যায়। কলেজ স্ট্রিটে গেলে ডাবল ডিসকাউন্টও পাওয়া যায়। যত সহজ বিকল্পই আসুক, তবু বইমেলা ইজ বইমেলা। এর সঙ্গে আর কোনও মেলার তুলনা চলে না। এত মানুষের ভিড়। সবাই কি বই কেনেন? বইয়ের দোকানে যেমন ভিড়, ফুডস্টলের ভিড়ও বেশি বই কম নয়। কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেন, এটা মূলত খাদ্য-মেলা, যেখানে বইও পাওয়া যায়। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরের নানা প্রান্তে নানা নামে খাদ্য মেলার তো অভাব নেই। সেখানে তো শুধুই খাবার। বইয়ের উৎপাত নেই। তাহলে সেখানে এমন ভিড় হয় না কেন? তাহলে, কোথাও একটা বইয়ের মাহাত্ম্য আছে বইকি। সেটা বোঝা যায়, যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামে। বা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। একেকটা স্টলের বাইরে এঁকে বেঁকে দীর্ঘ লাইন। শুধু একটু বই নেড়েচেড়ে দেখার আশায়। শুধু একটা, দুটো পছন্দের বই কেনার আশায়। আবার ছোটখাটো স্টলেও তো ভিড় কম নয়। লিটল ম্যাগের স্টলগুলোতেই বা এত ভিড় কেন? এই ছবিগুলোই তো এই আকালেও স্বপ্ন দেখায়।

INTERNATIONAL
KOLKATA
BOOK
FAIR
Publishers & Booksellers Guild

অযোধ্যা নয়, দাদু–নাতিতে বইমেলায়

সুরঞ্জন পাত্র

কদিন ধরেই টিভি চ্যানেলগুলো মেতে আছে মন্দির নিয়ে। যেন দেশে আর কোনও সমস্যাই নেই। যেন একটা মন্দিরই দেশের উন্নতির সোপান। যেন এই মন্দিরটা হয়ে গেলেই সারা বিশ্ব ভারতের নামে ধন্য ধন্য রব তুলবে।

অদ্ভুত এক বাতাবরণ। গোটা দেশকে মন্দির আবেগে ভাসানোর চেষ্টা। গোটা দেশকে মন্দির গেলানোর চেষ্টা। আমি বাপু নাস্তিক মানুষ। এতসব ধর্মকর্ম বুঝি না। ধর্মকে নিয়ে যদি কেউ বাণিজ্য করে, তখন তা থেকে আরও দূরে পালাই। এটুকু বুঝি, এই লোকটি ধার্মিকও নয়।

একদিকে, দেশজুড়ে অযোধ্যার প্লাবন। আর অন্যদিকে, আরও একজন। তিনি আবার সম্প্রীতি মিছিল ডেকে বসে আছেন। ওই দিনই তাঁকে পাল্টা কিছু একটা করতে হবে। পাল্টা একটা তাস খেলতে হবে। ভাবতে অবাক

লাগে, বিরোধী দলগুলি কী কর্মসূচি নেবে, সেটাও শাসক দল ঠিক করে দিচ্ছে। সবাইকেই কোনও না কোনও মন্দিরে ছুটতে হচ্ছে। বোঝাতে হচ্ছে, তাঁরাও রামকে শ্রদ্ধা করেন। একজন ফাঁদ পাতল। অন্যরা কী সুন্দর সেই পাতা ফাঁদে পা দিল।

অনেক হল ধর্মচর্চা। আমার তাহলে করণীয় কী? ঠিক করে নিলাম, আজ টিভি দেখব না। কাগজে এই সংক্রান্ত কোনও খবরও পড়ব না। যাঁরা এতে মেতে আছে, মেতে থাকুক। আমি ঠিক করলাম, বইমেলায় যাব। আমি থাকি মফস্বলে। এখান থেকে শিয়ালদা প্রায় একঘণ্টার পথ। যাওয়ার সময় তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু ফেরার সময় বিস্তর ভিড়। তাছাড়া, বয়সটাও তো বাড়ছে। তবু ঠিক করে নিলাম, বইমেলাই যাব। সঙ্গে নিলাম দশ বছরের নাতিকে। শুধু নিজে টিভির ওই অযোধ্যা-প্লাবন থেকে দূরে থাকলেই হবে না। মনে হল, ছোট্ট নাতিটাকেও এর থেকে দূরে রাখা দরকার।

দাদু-নাতি দুই ভাই মিলে চলে গেলাম মেলায়। আহ, যেন তাজা এক অক্সিজেন। আমার নাতিটি একটু ভোজনরসিক। বইয়ের থেকে খাবারের প্রতি একটু বেশি ঝোঁক থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই শুরুতেই মনে হল, ওর পেটটা আগে ঠান্ডা করা দরকার। নিয়ে গেলাম ফুড স্টলে। ওর পছন্দমতো জিনিস কেনা হল। আমিও সঙ্গ দিলাম।

ব্যাস, এবার তাহলে যাওয়া যাক বইয়ের সমুদ্রে। নিয়ে গেলাম দেব সাহিত্য কূটীরে। চাইছিলাম, ও কোনও একটা বই পছন্দ করুক। দেখলাম, এটা-সেটা নেড়েচেড়ে দেখছে। শেষমেশ লীলা মজুমদার আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের বই পছন্দ হল। অন্য একটা স্টলে গিয়ে ভ্রমণের ওপর একটা বই কিনতে চাইল। আরও একটা স্টলে গিয়ে খেলার দুটো বই। ফাঁকে ফাঁকে আমিও টুকটাক কিছু কিনে ফেললাম। আমার প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ। তাঁর প্রায় সব বই-ই পড়া। তবু বইমেলায় নতুন নতুন আঙ্গিকে বিভিন্ন প্রকাশক বিভূতিভূষণকে হাজির করেন। সেগুলো কিনব না! নতুন বই না হয় আরও একবার পড়ব! তাছাড়া, আমি অনেককেই বই উপহার দিই। কাউকে না হয় উপহার হিসেবেই দেওয়া যাবে।

সেলিব্রিটি দর্শনও কম হল না। আমি আবার সবাইকে ঠিকঠাক চিনি না। নাতি দেখলাম, অনেককেই চিনতে পারল। কয়েকজনের কাছে গিয়ে সেলফিও তুলল। সে তুলুক। ওর কাছে এই স্মৃতিটা থেকে যাবে। তাছাড়া, ঘরে থাকলে কীই বা করত! সেই তো ফেসবুকে মোদি বন্দনা দেখত। সেই তো অযোধ্যায় সেলিব্রিটিদের হাজিরা আর জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকা দেখত। তার থেকে বইমেলার এই ভীড়, এই বইয়ের সমুদ্র দেখা অনেক ভাল।

না, আমরা দাদু-নাতি মিলে পাল্টা কোনও মিছিলে যাইনি। কোনও মন্দিরে গিয়ে নিজেদের রামভক্ত প্রমাণ করার চেষ্টাও করেনি। আমরা গিয়েছিলাম বইমেলায়। হ্যাঁ, এটাই আমাদের প্রতিবাদ।

পড়া আর শোনা দিব্যি মিশে গেছে

মলয় সেন

বইমেলা মানেই বইয়ের সমুদ্র। এককে স্টলে হাজার হাজার বই। ক্রেতারা এসে লাইন দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। পরের দিন আবার হাজির হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন বই। সবমিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা কত? কোটি ছাপিয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, মানুষ যে এত বই নিয়ে যাচ্ছেন, আদৌ কি সেগুলো পড়া হয়! নিশ্চিতভাবেই যত বই কেনা হয়, তার অর্ধেকও পড়া হয় না। এটা শুধু এখনকার কথা নয়। পঞ্চাশ বছর আগেও পরিসংখ্যানটাও এমনই ছিল। মানুষ বই পড়ছে না, এই আক্ষেপ বহুকাল আগে থেকেই শুনে আসছি। লক্ষ লক্ষ বই বিক্রির পরেও এই অভিযোগ থাকবে। এটা নিয়ে গেল গেল রব তোলার কিছু নেই। হাহুতাশ করারও কিছু নেই।

বরং, আশার আলো ছড়িয়ে আছে দিতে দিকে। গত কয়েক বছরে পড়ার ছবিটাই যেন বদলে গেছে। প্রযুক্তি নানা দরজা খুলে দিয়েছে। প্রথমত, এখন বাঙালির বই কেনা আর শুধু বইমেলা নির্ভর নয়, এমনকী কলেজ স্ট্রিট নির্ভরও নয়। অনলাইনে সারা বছরই বই পাওয়া যায়। ঘরে বসেই অর্ডার দেওয়া যায়। ঘরে বসেই পাওয়াও যায়।

HUMAN FIGURE

সারাবছরই এই কেনাকাটা চলছে।

পিডিএফ বইয়ের রমরমা অনেকটাই বেড়েছে। বিভিন্ন অ্যাপে, সাইটে, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই পিডিএফ বই। যে যার সময়মতো ডাউনলোড করছেন। পড়ছেন। ভাল লাগলে শেয়ারও করছেন। বইয়ের ব্যবসা এতে কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, বলা মুশকিল। তবে বইয়ের বিস্তার যে অনেক বেড়েছে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার অডিও বুক। অন্তত এক্ষেত্রে লকডাউন এক বিশাল আশীর্বাদ। এই কয়েক বছরে কত লক্ষ লক্ষ অডিও বুক তৈরি হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। ইউটিউবে গল্প, উপন্যাস পাঠ। লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার। যাঁরা হয়ত হাতে বই নিয়ে পড়তেন না, তাঁরা বাসে বা ট্রেনে যেতে যেতেও দিব্যি শুনে নিচ্ছেন পছন্দের গল্প, উপন্যাস। তাঁরা হয়তো প্রত্যক্ষ পাঠক নন। কিন্তু পরোক্ষ পাঠক তো বলাই যায়। এই ইউডিউব আর অডিও বুকের হাত ধরে যদি বাংলা সাহিত্যে কানের মধ্যে দিয়ে মনে ঢুকে পড়ে, মন্দ কী?

তাই, আজকের দিনে বই আর শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। সে তার নিজের মতো করে ছড়িয়ে পড়েছে। পড়া আর শোনা মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে বিরাট এক ক্যানভাস। এই ক্যানভাস আরও প্রসারিত হোক। পড়া আর শোনার এই মেলবন্ধন বাংলা সাহিত্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক।

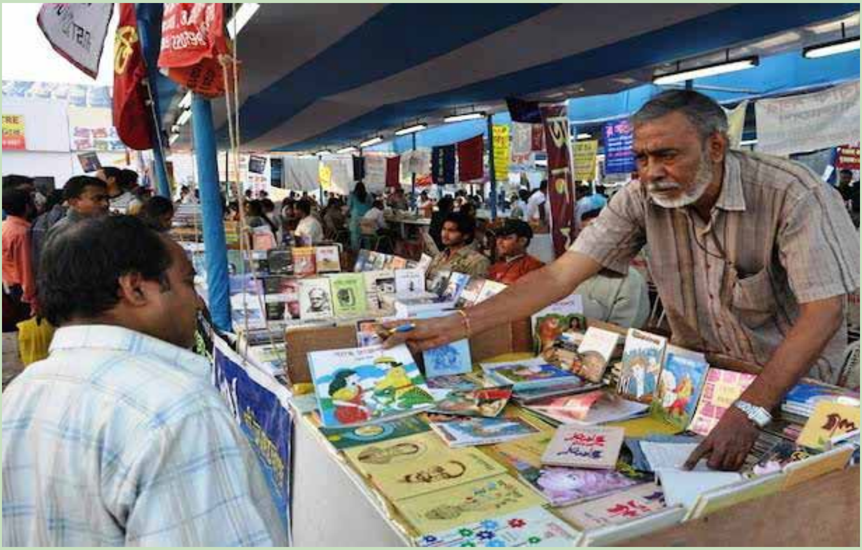

আমার ঠিকানা ওই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন

সুকর্ণ সিনহা

এখন সারা বছরই বইমেলা। নানারকম সাইট দেখুন। ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ দেখুন। ইচ্ছেমতো অর্ডার দিন। ঘরে বই পৌঁছে যাবে। তাই বলে কি আর বইমেলার আকর্ষণ কমে! এত এত মানুষের সমাগম দেখলে সত্যিই মন ভাল হয়ে যায়। মনে হয়, পৃথিবীতে এখনও সুস্থ চিন্তা করার লোক আছে।

বিভিন্ন স্টলে লোকেরা বই নেড়েচেড়ে দেখছেন। যে যাঁর পছন্দমতো বই কিনছেন। এর থেকে ভাল দৃশ্য আর কী হতে পারে! তবে এই বইমেলায় আমার আকর্ষণ একটু অন্যরকম। আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে।

কলেজে পড়ার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে

লিটল ম্যাগাজিনের ভূত চেপেছিল। যতদূর মনে পড়ে, গোটা দশেক সংখ্যা বের করেছিলাম। বিভিন্ন দিকপাল লেখকদের বাড়িতে ছুটেছিলাম লেখা আনতে। অনেকেই দিয়েছিলেন। অনেকে সময়ের অভাবে হয়ত দিতে পারেননি। আবার তখনকার অনেক উঠতি কবি, লেখাকের কাছ থেকেও লেখা নিয়েছিলাম। ভাবতে ভাল লাগে, আজ তাঁরা স্বনামধন্য। আজ বড় বড় প্রকাশকের ঘর থেকে তাঁদের বই বেরোয়। তাঁদের বই থেকে সিনেমা হয়।

তারপর যা হয়! কাজের সন্ধানে যে যার মতো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিজেদের মধ্যে ছোট খাটো ভুল বোঝাবুঝিও হল। সবমিলিয়ে উৎসাহে ভাটা পড়ল। নাম কে ওয়াস্তে দু একটা সংখ্যা বেরোলো। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই সেই ম্যাগাজিন একসময় ‘প্রাক্তন’ হয়ে গেল। এখনও আমার বাড়িতে সেই পুরনো সংখ্যাগুলো যত্ন করে সাজানো। এখন নানা পত্রপত্রিকায় টুকটাক লিখি। কিন্তু নিজেদের হাতে ম্যাগাজিন তৈরি করার যে আনন্দ, সেই রোমাঞ্চ এখনও যেন তাড়া করে।

নিজেরা লিটল ম্যাগাজিন করেছিলাম বলেই সেই আবেগটা আজও বুঝতে পারি। তাই বইমেলায় ওই স্টলগুলোতেই ঘুরঘুর করি। অনেক চেনামুখ। কারও বয়স পঞ্চাশ, তো কারও সত্তর। অনেকেই নিজের পকেট থেকেই বিরাট এই খরচ বহন করেন। অনেকে পেনশনের টাকার অনেকটা তুলে রাখেন ম্যাগাজিনের জন্য। অনেকের আবার ছেলে-মেয়ের প্রবল আপত্তি বাবা যেন বইমেলায় ওই লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে না বসে। এতে নাকি তাদের মানসম্মান থাকে না। কেউ আবার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে মেলায় আসেন। বই বিক্রি করেন।

মনে হতেই পারে, এঁরা কেন আসেন! কত টাকাই বা উঠে আসে! লোকে উল্টে পাল্টে দেখে। চলে যায়। অনেকে তো এদিকের ছায়াও মাড়ায় না। অনেকে আবার বলে, না বাবা, লিটল ম্যাগাজিনের দিকে যাব না। চেনা জানা কারও সঙ্গে দেখা হলেই বই গছিয়ে দেবে। এই লিটল ম্যাগ প্যাভিলিয়নের কাছেই থাকে ফুড পার্ক। খাবারের স্টলে নিমেশে লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হচ্ছে। অথচ, এদিকটায় কেউ ফিরেও তাকায় না।

এবার একটা জিনিস খুব ভাল লাগল। এই লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন সন্দীপ দত্তর নামাঙ্কিত। সত্যিই মনটা আনন্দে ভরে গেল। দু’বছর আগেও এই লোকটাকে এই প্যাভিলিয়নে দেখেছি। একটা টুল নিয়ে বসে থাকতেন। প্রায় চার দশক ধরে মানুষটা বাংলার নানা প্রান্ত থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনকে সংগ্রহে রেখেছেন। কত গবেষককে

তাঁদের গবেষণায় সাহায্য করেছেন। এমনও হয়েছে, যাঁরা একসময় পত্রিকা বের করতেন, তাঁদের কাছে পুরনো সংখ্যা নেই। অথচ, সন্দীপবাবুর কাছে সেই সংখ্যা ছিল। টুকরো টুকরো কত ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। এমন একটা মানুষকে গিল্ড যে এবার অনন্য সম্মান দিল, সত্যিই ভাল লাগছে। অন্তত এই কারণে, গিল্ডকে ধন্যবাদ দেওয়াই যায়।

এই লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নও আসলে একটা সমুদ্র। কত বিষয় সম্ভার। কত নানা ধরনের ভাবনার সংকলন। বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা হয়তো এসব নিয়ে বই করার সাহসই দেখাবে না। কারণ, এসব বইয়ের বাজার নেই। কিন্তু এই লিটল ম্যাগের লোকগুলো নাছোড়বান্দা। তাঁরা ভাল করেই জানেন, কেউ পড়বে না। টাকা উঠে এল কিনা, তাঁরা পরোয়াও করেন না। তাঁদের যা ভাল লাগে, তাঁরা তাই করেন। এই আনন্দ তাঁদের কাছ থেকে কে কেড়ে নেবে! সব বই কিনতে পারি না ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন স্টল ঘুরে বইগুলো দেখতে তো পারি। যেটা আজ কিনলাম না, সেটা হয়ত পরশু কিনে নিলাম। যেটা গত বছর কিনতে পারিনি, সেটা হয়ত এবছর কিনলাম।

এই প্রজন্ম নাকি বইবিমুখ। কিন্তু ওই স্টলে তো অনেক কমবয়সী ছেলেকেও দেখছি। তারা নানা বিষয় নিয়ে বই করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে যার মতো করে প্রোমোশন করছে। নামী লেখকদের লেখা আনছে। কেউ কেউ আবার পারিশ্রমিকও দিচ্ছে। কেউ কেউ দেখলাম, স্টল থেকেই বিভিন্ন প্রবাসী বন্ধুদের ফোন করছে। ঠিকানা চাইছে। বলছে, গুগল পে-তে টাকা পাঠিয়ে দাও, কুরিয়রে বই চলে যাবে। এদের নাছোড়বান্দা আবদারে ইচ্ছে না থাকলেও অনেকে সাড়া দিচ্ছেন। মাঝবয়সে এসে তারুণ্যের এই জোয়ার দেখে বেশ ভালই লাগে। নিজের পুরনো দিনগুলোয় যেন ফিরে যাই।

ভাগ্যিস বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারেন না

প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। বইমেলার শেষদিন। একটি ছবি ও তার অভিনব একটি ক্যাপশন। সেই মজার ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন সরল বিশ্বাস।।

বইমেলার শেষদিন বলতেই বাইশ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। বেশি ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি বিষয়ে ঢুকে পড়া যাক। এই প্রতিবেদক তখন সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় টুকটাক ফ্রিল্যান্স করতাম। কোথাও পারিশ্রমিক পাওয়া যেত। অধিকাংশ জায়গাতেই ফ্রিতে লেখালেখি।

তখনকার সময়ের এক জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। ঠিক হল, বইমেলার বারোদিন রোজ কাগজ বেরোবে। দুপুরের মধ্যে ছাপা হয়ে যাবে। দুপুরেই হকার সোজা বইমেলায় চলে যাবে। যা বিক্রি হবে, মূলত বইমেলায়। রাজনীতি, খেলা, সিনেমা-সব ধরনের খবরই থাকত। তবে বেশিরভাগ খবর ও প্রতিবেদন ও ছবি থাকত বইমেলা সংক্রান্ত। বেশিরভাগ দিনই লিড স্টোরি আমিই লিখতাম। আগেরদিনেই অনেক সময় লিখে রাখা হত। কম্পোজ হয়ে থাকত।

শেষদিন। সেদিনেরও লিড স্টোরি লেখার দায়িত্ব আমার উপর। শেষদিন মানে, কেমন একটা মন খারাপের ব্যাপার। এতদিনের এত ব্যস্ততা, বইপ্রেমীদের এই উৎসব, সব যেন অতীত হয়ে যাবে। বিদায় বেলার একটা করুণ সুর যেন বেজে উঠবে। মূলত এইরকম আবেগের ছোঁয়া দিয়েই লিড স্টোরিটা লেখা হয়েছিল। আগের রাতেই বাড়ি থেকে লিখে ফেলেছিলাম। সকালে সেটা প্রেসে যাবে।

সম্পাদক মশাই লেখাটা পড়লেন। বললেন, খুব ভাল হয়েছে। তবে অ্যাঙ্গেলটা একটু বদলে দে। কী অ্যাঙ্গেল করব? উনি নিজেই ঠিক করে দিলেন। শেষদিন, রবিবার। রেকর্ড ভিড় হবে। রেকর্ড ভিড় মানেই রেকর্ড বই চুরি। তাই শেষদিন বই চুরির আতঙ্কে ভুগছে প্রকাশকরা। এই অ্যাঙ্গেলে লেখাটা হবে। হাতে অল্প সময়। চটপট কয়েকজন প্রকাশককে ফোনে ধরা হল। অন্যান্যবার কী রকম বই চুরি হয়, এবার কী রকম চুরি হচ্ছে? কোন ধরনের বই বেশি চুরি হয়? অন্যান্য চোরদের সঙ্গে বইচোরদের তফাত কোথায়? এদের ‘পবিত্র পাপি’ বলা যায় কিনা? মূলত কোন বয়সের লোকেরা বেশি

বই চুরি করে? কেন চুরি করে? পড়ার জন্য নাকি বিক্রি করার জন্য, নাকি বন্ধুদের কাছে সস্তা ক্রেডিট নেওয়ার জন্য? ধরা পড়লে তাদের কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়? পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় নাকি ধমক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়? এই জাতীয় নানারকমের প্রশ্ন করা হল। দারুণ দারুণ সব উত্তর উঠে এল।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যুদ্ধ। দ্রুত লেখাটা লিখে ফেললাম। এডিটর মশাই চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘ভাল হয়েছে। এটাই চেয়েছিলাম। এই লেখাটা দারুণ হিট হবে।’ লেখাটা কম্পোজে চলে গেল। এবার ছবি বাছার কাজ শুরু। ছোট কাগজ। হাতে বেশি ছবি ছিল না। তখন গুগলে এসব ছবি পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। একদিন একজন ফটোগ্রাফার গিয়ে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে এনেছিল। সেই ছবিগুলোই একেকদিন একেকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাপা হত। যেগুলো বের করা হল, সবগুলোই আগের কয়েকদিনে ছাপা হয়ে গেছে। একটা ছবি ছাপা হয়নি। সেটা হল, একটি স্টলে কয়েকজন বিদেশি পর্যটক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

সম্পাদক মশাই সেই ছবিটাই পাঠিয়ে দিলেন স্ক্যান করতে। মনে খটকা লাগল, এই লেখার সঙ্গে এই ছবির কী সম্পর্ক? সেই খটকার কথা সম্পাদক মশাইকে জানালাম। তিনি খুব একটা পাত্তা দিলেন না। বললেন, বই চুরির তো ছবি হয় না। যা হোক কিছু একটা ছবি দিলেই হবে। কিন্তু মনটা তখনও খচখচ করছে। এই যে লেখা, তার সঙ্গে এই ছবির কী সম্পর্ক? ছবিটাকে তো জাস্টিফাই করতে হবে। এর ক্যাপশানই বা কী হবে?

ছবি স্ক্যান হয়ে এল। সম্পাদক মশাই তার তলায় ক্যাপশান করলেন— বই চুরিতে পিছিয়ে নেই বিদেশিরাও।

ভেবে দেখুন, কোন কপির সঙ্গে কোন ছবি! তার সঙ্গে কী অসাধারণ একটা ক্যাপশন। ভাগ্যিস, বিদেশিরা বাংলা পড়তে পারে না।

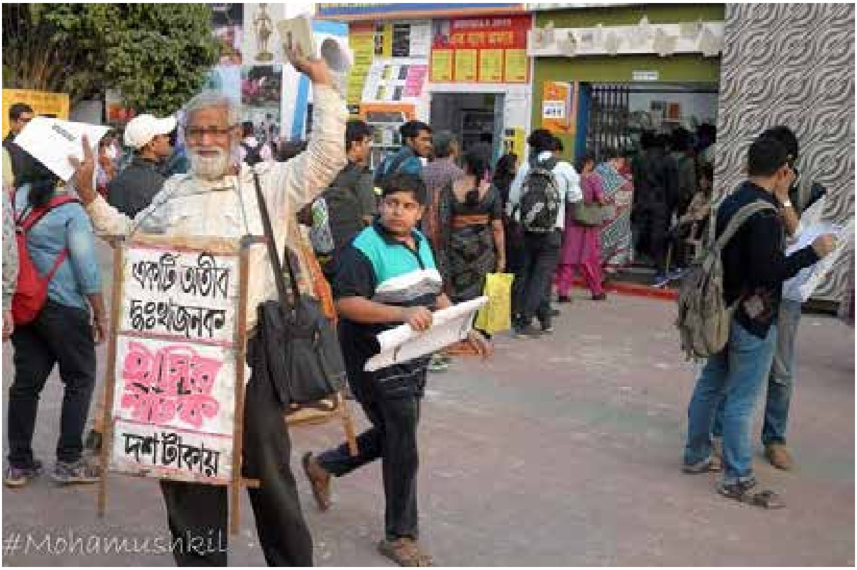

গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল

নিজের পত্রিকা নিজেই ফেরি করে বেড়ান। হাসিমুখে অন্যদের হাসিয়ে যান। এমনই এক চরিত্রকে তুলে ধরলেন পারিজাত সেন।

বিরাট বইমেলায় তাঁর কোনও স্টল নেই। আসলে, গোটা বইমেলা চত্বরই তাঁর স্টল। একমুখ দাড়ি। বুকে ও পিঠে ঝোলানো লম্বা পোস্টার। দুহাতে অসংখ্য ছোট ছোট বই। দু'হাত তুলে তিনি হেঁকে চলেছেন— মাত্র পাঁচ টাকা। পড়বেন কুড়ি মিনিট। হাসবেন একঘণ্টা। পড়া শুরু হবে, হাসি শুরু হবে। পড়া থামবে, হাসি থামবে না।

কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে! একটু স্মৃতি হাতড়ে পুরনো বইমেলাগুলোতে ফিরে যান। মুখটাও এবার নিশ্চয় মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ইনি অলোক কুমার দত্ত। বইমেলার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সেই শুরু থেকেই। বড় সেলিব্রিটি নন, স্টল জুড়ে তাঁর বইয়ের সম্ভার নেই, তাঁর বই কিনতে লম্বা লাইন

পড়ে, এমনও নয়। কেউ কখনও তাঁর অটোগ্রাফ চেয়েছে কিনা, তা-ও জানা নেই। তবু তিনি সাহিতের ফেরিওয়ালা। বইমেলায় তিনিও স্বতন্ত্র এক চরিত্র।

হেঁকে হেঁকে বই বিক্রি করার অভ্যেসটা সেই ১৯৭৫ থেকে। প্রথম বইমেলা থেকেই জড়িয়ে গেছেন এই উৎসবের সঙ্গে। তাঁর কথাতেই শোনা যাক। শুরুর বইমেলার সময় আমার নিজের কোনও পত্রিকা ছিল না। আমার দাদা-কবিরা আর বন্ধুরা মিলে বের করত কণ্ঠস্বর। আমি হেঁকে হেঁকে বিক্রি করতাম। সবাই যে স্টলে এসে কিনে নিয়ে যাবে, এমন আশা করাও ঠিক নয়। তাই স্টলে বন্দি না থেকে গোটা মাঠ জুড়ে বিক্রি করাই ভাল। অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছনো যায়। তারপর ১৯৮৭ নাগাদ চালু করলেন নিজের পত্রিকা স্বয়ংনিযুক্তি। শুরুতেই কবিতা সংখ্যা। তারপর করলেন হাসি সংখ্যা। হুড়হুড় করে সব বিক্রি হয়ে গেল। তৈরি হয়ে গেল সেই অভিনব স্লোগান। যা আজও প্রাণবন্ত। একই ক্যাপশন আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে, এটা অন্য দেশ হলে হয়ত 'ক্যাপশন অফ দ্য ডিকেড' বা অন্য কিছু পুরস্কার পেত।

হেঁকে হেঁকে বিক্রি করেন। অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয়ে যায়। তখন সঙ্কোচ হয় না! বাংলা আকাদেমি চত্বরে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'কে যে কীসে লজ্জা পায় আর কে যে কীসে গর্ব অনুভব করে, তা বোঝা খুব মুশকিল। একজন মাতাল মদ খেয়ে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে যায়। ভাবে সে বোধহয় দারুণ মূল্যবান কথা বলছে। অনেক বড় বড় মানুষও এমন কাজ করে, যা বেশ হাস্যকর। কিন্তু তারা ভাবে, তারা বুঝি দারুণ কিছু করছে। তাছাড়া, চুরি-ডাকাতি তো করছি না। নিজের পত্রিকা নিজে বিক্রি করি। লজ্জা পেতে যাব কেন? দাদাঠাকুরকে নিশ্চয় জানেন! তিনিও কিন্তু নিজের পত্রিকা নিজেই হেঁকে হেঁকে বিক্রি করতেন। তাঁর মতো মানুষ যদি পারেন, আমার প্রেস্টিজে লাগবে কেন? আমি নিশ্চয় তাঁর চেয়ে বড় নই। আমার অনেক পরিচিত লোক অবশ্য বলে, কেন ভাঁড়ের মতো বই নিয়ে চিৎকার করিস? আমি তাদের বলি, আমি ভাঁড় হতে পারি, ছোটলোক তো নই।

বইমেলা আসে, বইমেলা ফুরিয়েও যায়। বাকি সময়টা তাহলে কী করেন? আসলে, অলোকবাবু পেশায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ছোট থেকেই আঁকার শখ। তাই ভর্তি হয়ে গেলেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। আঁকার কাজের পাশাপাশি চলল আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক। না, কোনও তারকা কবির কবিতা নয়, কবিতা খুঁজে বের করেন লিটল ম্যাগ থেকে। আর তাঁর শ্রুতিনাটক কখনও উঠে আসে সতীনাথ মুখার্জি, কখনও দেবরাজ রায়ের কণ্ঠে। বিদেশেও বেশ কিছু জায়গায় অভিনয় হয়েছে তাঁর লেখা শ্রুতিনাটক। আর শীত এলেই মন ছুটে যায় বইমেলায়। শুধু কলকাতা বইমেলা নয়। বিভিন্ন জেলার বইমেলায় ঠিক পৌঁছে যান। পৌঁছে যান প্রতিবেশী রাজ্যেও।

কী রকম বিক্রি হয়? কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ছুঁড়ে দিলেন পাল্টা রসিকতা, 'কত লিখবেন? তার চেয়ে আপনি বরং লিখুন, ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলায় কে আর জড়াতে চায়?'

জয় গোস্বামীর থেকে ঋতুপর্ণার কদর বেশি!

একাকী দাঁড়িয়ে জয় গোস্বামী, কেউ চিনতেও পারছেন না। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছেন ঋতুপর্ণা। তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার কী হুড়োহুড়ি! এ কোন বইমেলা? লিখলেন রাহুল বিশ্বাস।।

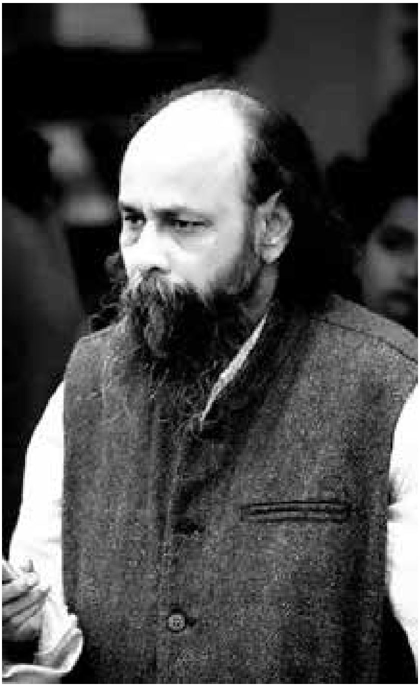

বইমেলা মানেই বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। সবটা যে খুব আনন্দ দিয়ে যায়, এমন নয়। এমন কিছু ঘটনা নজরে পড়ে যায়, যা হয়ত কাঙ্খিত ছিল না। বছর চারেক আগের একটি স্মৃতি তুলে ধরছি। অফিস ছুটির পর গেছি করুণাময়ীতে। তেমন ভিড় ছিল না। বইমেলা মানেই বিভিন্ন সাহিত্যিকের দেখা মিলবে, এ আর নতুন কথা কী? যখন থেকে বইমেলা আসছি, কত সাহিত্যিককে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের ঘিরে কত ভিড়, কত সই শিকারির আবদার। কত ছবি তোলার আবদার। সেদিন একটু অন্যরকম ছবি। একটু দূরে একাকী দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি জয় গোস্বামী।

যাঁরা হেঁটে যাচ্ছিলেন, অনেকেই তাঁকে চিনতেও পারলেন না। ভাবতে বেশ অবাকই লাগল। বইমেলায় এসেছে, অথচ জয় গোস্বামীকে চেনে না! এরা কারা? এরা বইমেলায় আসে কেন? আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখে যাচ্ছি। টানা দশ–পনেরো মিনিট কাটল। একজনকেও দেখলাম না কবির সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা বলছেন। একবার মনে হল যাই। গিয়ে নমস্কার করে আসি। পরে মনে হল, গিয়ে কীই বা বলব! বলব, আপনার কবিতা পড়েছি? এমন বোকা বোকা কথা শুনলে তিনি হয়ত বিরক্তই হবেন। কারণ, এমন কতা কয়েক লক্ষ বার শুনেছেন। তাছাড়া সত্যিই তো, কতটুকুই বা পড়েছি? তাঁর কটা বই কিনেছি? কটা কবিতা মুখস্থ বলতে পারি? আবৃত্তির সুবাদে বিখ্যাত হয়ে ওঠা কয়েকটা কবিতার কথা হয়ত জানি।

সেগুলো দাঁত কেলিয়ে বলতে যাওয়া মানে কবিকে বুঝিয়ে দেওয়া, যেটুকু শুনেছি আবৃত্তির দৌলতে। বই কিনে নয়।

এসব মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ দেখলাম একটা ভিড় কবির পাশ দিয়ে চলে গেল। অন্তত পঞ্চাশ জনের ভিড়। কী ব্যাপার? কাকে ঘিরে এই ভিড়। দেখলাম গটগট করে হেঁটে চলেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁকে ঘিরে ছজন বাউন্সার। আর যা হয়! পেছন পেছন বিরাট একটা ভিড়। ঋতুপর্ণা কোন স্টলে যাচ্ছিলেন, কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন, জানি না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে এই আদেখলাপনা দেখে কিছুটা খারাপই লাগল। যাঁরা ঋতুপর্ণার পেছনে পেছন একটু ছবি তোলার জন্য ছুটে গেলেন, তাঁরা কেউ পাশে দাঁড়ানো জয় গোস্বামীর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। এমনকী স্বয়ং ঋতুপর্ণাও জয় গোস্বামীকে চিনতে পারলেন না। পারলেও এক সেকেন্ড দাঁড়ানোর সৌজন্য দেখালেন না।

এ কোন বইমেলা, যেখানে ঋতুপর্ণার পেছনে এমন ভিড়, অথচ জয় গোস্বামীকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়! কেউ ফিরেও তাকায় না। কবি নিজেও তাকিয়ে রইলেন ভিড়ের দিকে। ভিড় চলে গেল। তিনি রাস্তার ধারে একাকী দাঁড়িয়েই রইলেন। কী ভাবছিলেন, মনে মনে কোনও কবিতা জন্ম নিচ্ছিল কিনা জানি না। হ্যাঁ, এই হুড়োহুড়ি, এই আদেখলাপনা—এটাই হয়ত মূলস্রোত বইমেলা। নির্বাক মুখ নিয়ে একাকী কবির দাঁড়িয়ে থাকা, এটাও বইমেলা।

বই তো কিনলেন, এবার?

নতুন বছরে বাঙালির নতুন পার্বণ— বইমেলা। দেখতে দেখতে শুরুও হয়ে গেল। স্বভাবতই বইপত্র নিয়ে আলোচনা চলবে। অনেকেই নতুন নতুন বই কিনবেন। একে একে পড়াও শুরু হয়ে যাবে। কোন বইটা কেমন লাগল? কী বিষয়বস্তু, চাইলে পাঠকদের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন।

চাইলে বেঙ্গল টাইমসের মাধ্যমে সেই লেখককে খোলা চিঠিও লিখতে পারেন। আপনি লিখে পাঠান আপনার অভিজ্ঞতা। সংশ্লিষ্ট লেখকের কাছে সেই লেখার লিঙ্ক আমরা পৌঁছে দেব। তবে প্রথাগত বুক রিভিউ নয়। আপনি লিখুন একেবারেই আপনার নিজস্ব অনুভূতির কথা। অকারণ প্রশস্তি নয়, অকারণ আক্রমণও নয়। যা মনে হচ্ছে, তাই লিখুন।

শুধু যে নতুন বই নিয়েই আলোচনা, এমন নয়। বইটি হয়ত পাঁচ বছর আগের, কিন্তু আপনি নতুন কিনলেন, নতুন পড়লেন। সেই অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে। সার্বিকভাবে বইমেলার নানা গল্প ও অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে।

আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

bengaltimes.in@gmail.com

প্রবাসের চিঠি

বইমেলা বললে সেই ময়দানকেই মনে পড়ে

বইমেলার সঙ্গে ময়দানের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে। সেটাই বইমেলার আদর্শ জায়গা। আবার সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক। মুম্বই থেকে এমনই দাবি তুললেন অরিত্র ঘোষাল।।

করোনার সময়টুকু বাদ দিলে করুণাময়ীই এখন বইমেলার স্থায়ী ঠিকানা। যদিও কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকার সুবাদে এই করুণাময়ীর বইমেলায় একবারও যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভিনরাজ্যে থাকলেও মন পড়ে থাকে সেই বইমেলাতেই। কী বই বেরোচ্ছে, কোন বিষয়ে সেমিনার আছে, দূর থেকেই খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, করুণাময়ীতে বইমেলা হচ্ছে, এই দৃশ্যটা মন থেকে এখনও ঠিক মানতে পারি না।

একজন বইপ্রেমী মানুষ হিসেবে মনে করি, ময়দানই হল বইমেলার আদর্শ জায়গা। বাঙালির আবেগের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে ময়দান। ছোটবেলায় প্রথম গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। পরের বছর গেলাম বন্ধুদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে বাধা আসেনি। আমার বইমেলায় যাওয়াকে বাবা বেশ প্রশ্রয়ের চোখেই দেখতেন। কী কী বই কিনলাম, জানতে চাইতেন। কখনও কখনও তিনিও সেই বই পড়তেন।

আজ বাবাও নেই। কর্মসূত্রে আমিও বাংলার বাইরে। বইমেলারও ঠিকানা বদলে গেছে। ময়দান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কয়েকবছর সে ঠাঁই নিয়েছিল মিলন মেলায়। পরে সেখান থেকে উঠে এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে।

একবার বইমেলার সময় কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিন দিন ছিলাম। তিনদিনই মিলন মেলায় গিয়েছিলাম। কেন জানি না, মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারিনি। একটা কর্পোরেট কর্পোরেট ব্যাপার। সেই প্রাণটা যেন ছিল না। বইমেলা বলতেই চোখ বুজলে এখনও সেই ময়দানের কথাই মনে পড়ে। একটু ধুলো উড়ত। কেন জানি না, সেই ধুলো বেশ ভালই লাগত। ফেরার সময় পার্ক স্ট্রিট থেকে শিয়ালদার বাস ধরতাম। সেখান থেকে ট্রেনে রানাঘাট।

মাঝে শুনেছিলাম, বইমেলা হবে ইকো পার্কে। সেখানে এখনও যাওয়া হয়নি। তবে গুগল ম্যাপে দেখেছি, জায়গাটা অনেক দূরে। কলকাতার মানুষ হয়ত যেতে পারবেন। কিন্তু জেলা বা মফস্বলের লোকের পক্ষে যাওয়া মুশকিল। ফেরা তো আরও মুশকিল। সেন্ট্রাল পার্ক যোগাযোগের দিক থেকে কিছুটা কাছে। মেট্রো হওয়ায় কিছুটা সুবিধাও হয়েছে। সরকার এই প্রাঙ্গণকে স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ হিসেবে ঘোষণাও করেছে। তবু মনে থেকে এই সেন্ট্রাল পার্ককে এখনও মেনে নিতে পারছি না। যাঁরা গাড়ি নিয়ে যাবেন, তাঁরা গাড়ি রাখার জায়গা পাবেন না। যাঁরা বাসে ফিরতে চাইবেন, তাঁরাও ঠিকঠাক বাস পাবেন না। অটোতেও বেশ বিশৃঙ্খলা হবে। শিয়ালদা রুটের লোকেরা তবু ফিরতে পারবেন, কিন্তু হাওড়ার দিক থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু ময়দানে হলে নানা প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই আসতে পারতেন। চন্দননগর বা পাঁশকুড়ার লোকেরাও এই ভরসা নিয়ে আসতেন যে, ফিরতে কোনও সমস্যা হবে না।

এখন একটা অদ্ভুত সময়। বিশেষ একজন যে সুরে কথা বলেন, সবাই সেই সুরেই কথা বলেন। তাঁর কথাই ঠিক, এটা প্রমাণ করতেই ব্যস্ত থাকেন। তাই কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর এখন তেমন খুঁজে পাই না। তাই ময়দানকে ঘিরে অনেকের নস্টালজিয়া থাকলেও তা প্রকাশ করতে দেখা যায় না। কী জানি, যদি তিনি রেগে যান! প্রবাস থেকেই আমার দাবি, আবার বইমেলাকে তার হারিয়ে যাওয়া ঠিকানায় ফিরিয়ে আনা হোক। আদালত বা ফোর্ট উইলিয়াম খুশি হবে কিনা জানি না। তবে বইপ্রেমী মানুষ খুশি হবেন।

GREAT
BRITISH COUNCIL
ENTRY

নন্দ ঘোষের কড়চা

পথে এসো বাবাজীবন

নন্দ ঘোষ আবার বইমেলায় হাজির। ব্রিটেনের থিম প্যাভিলিয়নেও পৌঁছে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে হল গিল্ডের মহাপণ্ডিত মাতব্বর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়কে একটু প্রেম নিবেদন করবেন। সেই প্রেমপত্র কেমন হতে পারে? পড়ে নিন। জেনে নিন।

সেই যে রেজ্জাক মোল্লা বলেছিলেন, ‘হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে গেছে,’ কথাটা খাপে খাপে মিলে যায় ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। ত্রিদিব চাটুজ্যে, মানে বইমেলার আয়োজক গিল্ড-এর ত্রিদিববাবু। লোকে বলে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে গিরগিটি নামক একটি প্রাণীর মিল আছে। তের-চোদ্দ বছর আগেও তিনি ছিলেন টকটকে লাল। আবার এখন কটকটে সবুজ। থুড়ি নীল সাদা।

কিন্তু আমরা ওই সব জটিল রাজনৈতিক বিতর্কে ঢুকতে চাই না। আমাদের আজকের বিষয় হল বইমেলার থিম। আচ্ছা, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে কি চীনের সিনেমা, ইরানের সিনেমা ইত্যাদি থিম থাকে? খাদ্য মেলায় কি মোগলাই খাবার, ইতালিয়ান খাবার ইত্যাদি থিম থাকে?

থাকে না। মেলা মানে হরেক জিনিস ছড়িয়ে থাকবে। যার যেটা খুশি কিনবে। মেলার আবার থিম কী হে?

কিন্তু বইমেলায় থিম থাকে। এবং থিমের লিস্টি দেখে মনে হবে, বাংলা ভাষার, ভারতের সব ভাষার সাহিত্য গুলে খাওয়া হয়ে গেছে। তাই বিদেশ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। আচ্ছা বুকে হাত রেখে বলুন তো, আমরা কজন, সতীনাথ ভাদুড়ির লেখা পড়েছি? অদ্বৈত মল্লবর্ধনের লেখা পড়েছি? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা পড়েছি? প্রমথনাথ বিশির লেখা পড়েছি? পড়া দূরের কথা, ৯০ শতাংশ বাঙালি এঁদের নাম শোনেনি। সদিচ্ছা থাকলে এঁদের বইমেলার থিম করা যেত। একেক মেলায় একেকজন। যেমন, গত কয়েকবছর ধরে প্রয়াত সাহিত্যিকদের নামে প্যাভিলিয়ন হয়েছে। ভাল উদ্যোগ। কিন্তু সেখানে ঢুকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এঁদের কোনও চিহ্নই নেই। এমনকী বাংলা ভাষার বইও খুঁজে মেলা ভার।

বাংলার বাইরে বেরতে চাইলে ভারতের কোনও রাজ্যকে থিম করা যেত। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, অসম, ওড়িশা এই সব রাজ্য থিম হলে আমরা অমৃতা প্রীতম সিং, ইন্দিরা গোস্বামী, ফকিরমোহন সেনাপতি, আর কে নারায়ণন, গিরিশ কারনাড প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জানতে পারতাম। ভিনরাজ্যের সাহিত্য সম্পর্কে, সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি! বইমেলার হাত ধরে যদি ভিনরাজ্যের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেত, মন্দ হত না।

কিন্তু ত্রিদিববাবুরা তো আন্তর্জাতিক

বইমেলা করেন। রাজ্য বা দেশ নিয়ে থিম করলে তাঁদের মান–ইজ্জত চলে যাবে। তাছাড়া বিদেশ নিয়ে থিম করলে গিল্ড-এর খরচে সেই দেশটা ঘুরে আসা যায়। আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন ঘোরা হয়ে গেছে। লাতিন আমেরিকাও বাকি নেই। পুরুলিয়ার খবর রাখে না, পেরুর গপ্পো ঝাড়ছে। কখনও থিম হয়েছে কোস্টারিকা, কখনও আবার গুয়াতেমালা। এঁদের গলায় যে কোন মালা পরাই! কতসব বোদ্ধা। কোস্টারিকা গুয়াতেমালার থিম বুঝে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। কোনদিন হয়তো থিম হবে আন্টার্কটিকা। আগেরবারের থিম ছিল স্পেন। কী আশ্চর্য, কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী শিল্প আনবেন বলে স্পেনে ছুটলেন। কলকাতার ক্লাবের কর্তাদের ধরে নিয়ে গেলেন। বইমেলার কর্তাদেরও নিয়ে গেলেন। না এল শিল্প, না গেল সাহিত্য।

এবার বোধ হয় সম্বিত ফিরেছে। স্প্যানিশ সাহিত্য থেকে এবার তাঁরা ইংরাজি সাহিত্যে ফিরেছেন। মানে, থিম হয়েছে ব্রিটেন। থিম না ঘোড়ার ডিম। ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নের বাইরে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলার মজাই আলাদা। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গাও রাখা আছে। আচ্ছা, ওখান থেকে কজন বই কিনলেন! খুব জানতে ইচ্ছে করে। তবে, কোস্টারিকা, গুয়াতেমালার থেকে অন্তত থিম হিসেবে ব্রিটেন মন্দ নয়।

বিদেশ ঘোরা তো অনেক হল। এবার না হয় দেশের দিকে একটু তাকানো যাক। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে থিম হোক। না হয় হিন্দি দিয়েই শুরু হোক।

(নন্দ ঘোষের কড়চা। বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি বিভাগ। নানা সময় তিনি নানা জায়গায় হাজির হয়ে যান। বাঁকা চোখে, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তাঁর পাঁচালি লেখেন। এটিকে মজা হিসেবেই দেখতে পারেন।)

প্রবাসের চিঠি

বইমেলা বললে সেই ময়দানকেই মনে পড়ে

বইমেলার সঙ্গে ময়দানের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে। সেটাই বইমেলার আদর্শ জায়গা। আবার সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক। মুম্বই থেকে এমনই দাবি তুললেন অরিত্র ঘোষাল।।

করোনার সময়টুকু বাদ দিলে করুণাময়ীই এখন বইমেলার স্থায়ী ঠিকানা। যদিও কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকার সুবাদে এই করুণাময়ীর বইমেলায় একবারও যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভিনরাজ্যে থাকলেও মন পড়ে থাকে সেই বইমেলাতেই। কী বই বেরোচ্ছে, কোন বিষয়ে সেমিনার আছে, দূর থেকেই খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, করুণাময়ীতে বইমেলা হচ্ছে, এই দৃশ্যটা মন থেকে এখনও ঠিক মানতে পারি না।

একজন বইপ্রেমী মানুষ হিসেবে মনে করি, ময়দানই হল বইমেলার আদর্শ জায়গা। বাঙালির আবেগের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে ময়দান। ছোটবেলায় প্রথম গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। পরের বছর গেলাম বন্ধুদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে বাধা আসেনি। আমার বইমেলায় যাওয়াকে বাবা বেশ প্রশ্রয়ের চোখেই দেখতেন। কী কী বই কিনলাম, জানতে চাইতেন। কখনও কখনও তিনিও সেই বই পড়তেন।

আজ বাবাও নেই। কর্মসূত্রে আমিও বাংলার বাইরে। বইমেলারও ঠিকানা বদলে গেছে। ময়দান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কয়েকবছর সে ঠাঁই নিয়েছিল মিলন মেলায়। পরে সেখান থেকে উঠে এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে।

একবার বইমেলার সময় কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিন দিন ছিলাম। তিনদিনই মিলন মেলায় গিয়েছিলাম। কেন জানি না, মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারিনি। একটা কর্পোরেট কর্পোরেট ব্যাপার। সেই প্রাণটা যেন ছিল না। বইমেলা বলতেই চোখ বুজলে এখনও সেই ময়দানের কথাই মনে পড়ে। একটু ধুলো উড়ত। কেন জানি না, সেই ধুলো বেশ ভালই লাগত। ফেরার সময় পার্ক স্ট্রিট থেকে শিয়ালদার বাস ধরতাম। সেখান থেকে ট্রেনে রানাঘাট।

মাঝে শুনেছিলাম, বইমেলা হবে ইকো পার্কে। সেখানে এখনও যাওয়া হয়নি। তবে গুগল ম্যাপে দেখেছি, জায়গাটা অনেক দূরে। কলকাতার মানুষ হয়ত যেতে পারবেন। কিন্তু জেলা বা মফস্বলের লোকের পক্ষে যাওয়া মুশকিল। ফেরা তো আরও মুশকিল। সেন্ট্রাল পার্ক যোগাযোগের দিক থেকে কিছুটা কাছে। মেট্রো হওয়ায় কিছুটা সুবিধাও হয়েছে। সরকার এই প্রাঙ্গণকে স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ হিসেবে ঘোষণাও করেছে। তবু মনে থেকে এই সেন্ট্রাল পার্ককে এখনও মেনে নিতে পারছি না। যাঁরা গাড়ি নিয়ে যাবেন, তাঁরা গাড়ি রাখার জায়গা পাবেন না। যাঁরা বাসে ফিরতে চাইবেন, তাঁরাও ঠিকঠাক বাস পাবেন না। অটোতেও বেশ বিশৃঙ্খলা হবে। শিয়ালদা রুটের লোকেরা তবু ফিরতে পারবেন, কিন্তু হাওড়ার দিক থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু ময়দানে হলে নানা প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই আসতে পারতেন। চন্দননগর বা পাঁশকুড়ার লোকেরাও এই ভরসা নিয়ে আসতেন যে, ফিরতে কোনও সমস্যা হবে না।

এখন একটা অদ্ভুত সময়। বিশেষ একজন যে সুরে কথা বলেন, সবাই সেই সুরেই কথা বলেন। তাঁর কথাই ঠিক, এটা প্রমাণ করতেই ব্যস্ত থাকেন। তাই কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর এখন তেমন খুঁজে পাই না। তাই ময়দানকে ঘিরে অনেকের নস্টালজিয়া থাকলেও তা প্রকাশ করতে দেখা যায় না। কী জানি, যদি তিনি রেগে যান! প্রবাস থেকেই আমার দাবি, আবার বইমেলাকে তার হারিয়ে যাওয়া ঠিকানায় ফিরিয়ে আনা হোক। আদালত বা ফোর্ট উইলিয়াম খুশি হবে কিনা জানি না। তবে বইপ্রেমী মানুষ খুশি হবেন।

লেখক কিন্তু নজর রাখছেন

উত্তম জানা

আপনি কিন্তু স্ক্যানারে আছেন।

আপনি বই কিনলেন না কিনলেন না, লেখক কিন্তু ঠিক নজর রাখছেন।

গত বছর থেকেই অদ্ভুত একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আপনি স্টলে গেলেন। বই নেড়েচেড়ে দেখলেন। আপনার অজান্তেই আপনার ছবি উঠে যাচ্ছে।

এবার হয়ত বই কিনলেন। ক্যাশমেমো দেওয়ার সময় জানতে চাওয়া হচ্ছে আপনার নাম। আপনি ভাবছেন, ক্যাশমেমো তো আপনাকেই দেওয়া হবে। সমস্যা কোথায়? কিন্তু খেয়াল করলেন না, কার্বন কপিতে আপনার নাম থেকে গেল।

এবার হয়ত বলা হল, স্যার, আপনি বইটা নিয়ে একটু দাঁড়ান। একটা ছবি তুলে নিই। ব্যাস, ছবি উঠে গেল। একটু পরেই হয়ত সেই ছবি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পৌঁছে গেল লেখকের কাছে। অমনি কিছুক্ষণ পর দেখলেন, লেখক তাঁর ফেসবুক পেজে আপনার ছবি আপলোড করে দিলেন। বা, সেই প্রকাশনা সংস্থাও হয়ত ছবি সাঁটিয়ে দিল।

কোনও কোনও লেখক হয়ত কিছুটা সংযমী। তিনি হয়ত আপনার ছবি শেয়ার করলেন না। কিন্তু মুহূর্তে জেনে গেলেন, আপনি তাঁর বই কিনেছেন।

বিপদটা এখানে নয়। বিপদটা আসলে অন্য জায়গায়। আপনি ফেসবুকে সেই লেখকের ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। কথায় কথায় লাইক করেন। মেসেজ করেন। হয়ত কভারের ছবি তুলে তাঁকে পাঠিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে, বইটা কিনেছেন। লেখক কিন্তু জানেন, আপনি আদৌ কিনেছেন কিনা। সুতারং, গুল দেওয়ার আগে সাবধান থাকুন।

আবার কোনও কোনও লেখব ফেবু মারফত পাঠককূলকে জানিয়ে দিলেন, অমুক সময় স্টলে থাকব। বন্ধুরা আসুন, দেখা হবে। আসলে, প্রকাশককে তো বোঝাতে হবে, আমার কিছু পাঠক আছে। আমার বই কিনতে, আমার সঙ্গে দেখা করতে অনেক পাঠক আসে। আমার বই ছেপে আপনি ভুল করেননি।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও টিআরপি বিশেষ ওঠে না। বই স্টলে পড়েই থাকে। ফেবু বন্ধুরা যে আসলে পাঠক নয়, এই ভুলটা কবে যে ভাঙবে!

ধন্যবাদ লকডাউন, বই পড়ার অভ্যেস ফিরিয়ে দিলে

নিখিল সেন

মনে আছে, একসময় খুব লাইব্রেরি যেতাম। রোজ একটা বা দুটো করে বই নিয়ে আসতাম। পরেরদিন যেতাম সেগুলো ফেরত দিতে। একদিনেই দুটো বই পড়া হয়ে যেত। যদি দুটো নাও হয়, একটা তো শেষ হতই। সেটাই বদলে নিয়ে আসতাম। যদিও সেই সময় মোটা বই পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়নি। লাইব্রেরিয়ান কাকু বলতেন, ওগুলো বড়দের বই। বড় হয়ে পড়বে। আমরাও বিশ্বাস করতাম। তাই ছোটদের জন্য নির্ধারিত বইগুলোই নিয়ে আসতাম। তাছাড়া, ছোট বই একদিনে শেষ হয়। বড় বই শেষ হতে অনেক সময় লাগে। সেই কারণেও ছোটদের বই নিতাম।

তখনও অমনিবাস, বিভিন্ন সংকলনের তেমন চল ছিল না। ফলে ফেলুদা বা কাকাবাবু সমগ্র পড়া হয়নি। খুচরো খুচরো বইগুলোই পড়েছি। কখনও কখনও আগাথা ক্রিস্টি বা শার্লোকহোমসও পড়েছি। গোয়েন্দা কাহিনি থেকে শুরু। পরের দিকে এভাবেই শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, লীলা মজুমদার, সমরেশ মজুমদারদের লেখাও পড়েছি।

মাধ্যমিকের পর থেকেই সবকিছু কেমন যেন বদলে গেল। লাইব্রেরি যেতাম। তবে, আগের মতো নিয়মিত নয়। উচ্চ মাধ্যমিকের পর আরও কিছুটা কমল। এভাবেই বইয়ের সঙ্গে কেমন যেন একটা দূরত্ব তৈরি হল। বইমেলায় টুকটাক বই কেনা হত। সব যে পড়া হত, এমনটা বলা যাবে না। আমার কাছে করোনা ও লকডাউন এক মস্তবড় আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। আবার সেই হারানো বই পড়ার অভ্যেস ফিরে এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে অডিও বুক। আগে এটাকে তেমন পাত্তা দিতাম না। কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকটা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছি। বেশ ভাল

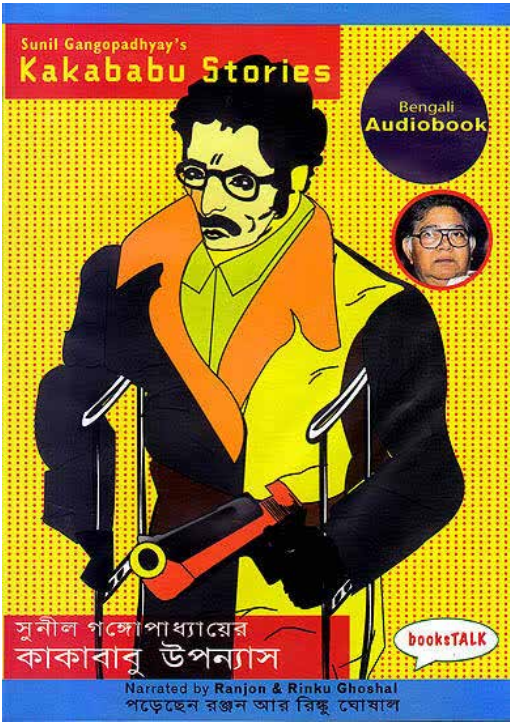
Sunil Gangopadhyay's
Kakababu Stories
Bengali
Audiobook
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কাকাবাবু উপন্যাস
booksTALK
Narrated by Ranjon & Rinku Ghoshal
পড়েছেন রঞ্জন আর রিঙ্কু ঘোষাল

ভাল কিছু গল্প পাচ্ছি। কয়েকজন তো রীতিমতো ভাল গল্প পাঠ করছেন। বেশ ভাল ভাল গল্প তুলে আনছেন। রোজ এভাবেই বেশ কয়েকটা গল্প শুনে নিচ্ছি।

একসময় রাতে ঘুমোনোর আগে গান শোনার অভ্যেস ছিল। কত রাত এভাবেই ভোর হয়েছে। এখন অন্ধকারে আপন মনে একের পর এক গল্প শোনার অভ্যেস তৈরি হয়েছে। কারও সমস্যাও হচ্ছে না। আর চোখ বন্ধ করে শোনার ফলে মন দিয়ে শোনাও হচ্ছে। গত দু' বছরে অন্তত পঞ্চাশখানা উপন্যাস পড়েছি। শুনেওছি অন্তত পঞ্চাশখানা। আর গল্পের সংখ্যা তো প্রায় হাজার। যাঁদের বই কখনও কেনা হয়নি, যাঁদের লেখা কখনও পড়া হয়নি, কৌতূহলে তাঁদের লেখাও পড়ে ফেললাম, শুনে ফেললাম।

এখন আমার ফোনে অসংখ্য গল্প। সারা দিনে দেড় জিবি ফ্রি নেটের সুবাদে মনের সুখে সেইসব গল্প ডাউনলোড করে রাখছি। এখন স্টক এতটাই যে, এক বছর নেট কানেকশন না থাকলেও চলবে। ওগুলোই ঘুরে ফিরে দিব্যি শোনা যাবে। এই লকডাউন আমার কাছে সেদিক থেকে অনেক উপকারী বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে হাজির হল। আমাদের সাহিত্যপ্রেমে যে ধুলো জমেছিল, সেই ধুলো অনেকটাই ঝেড়ে দিল। পাশাপাশি, অডিও বুকের ব্যাপারে যে নাক সিঁটকানো ব্যাপার ছিল, সেটাও অনেকটা কেটে গেছে। যাঁরা সাহিত্যপ্রেমী, অথচ অডিও বুক থেকে এখনও দূরে আছেন, তাঁরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সাহিত্যের এই নতুন ধারাকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানান।

স্মৃতিটুকু থাক

বইমেলার সেই দুপুরে

SHISHU PORA GHOR
শিশু পড়া ঘর

বইমেলা মানে কি শুধুই বই কেনা? শুধুই ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া! বইমেলা এলেই আমার কিছু পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। স্মৃতিটুকু থাক বিভাগে তা ভাগ করে নেওয়া যাক। নয়ের দশকের গোড়ায় কলেজ জীবনে আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত। নামটা বলে তাকে আর বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না। মেয়েটির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল। মেয়েটিরও বোধহয় ছিল। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলতে পারিনি। পরীক্ষার পরই বোধ হয় তার বিয়ে হয়ে যায়। আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ বইমেলায় দেখা। সঙ্গে এক পুরুষ, সম্ভবত তার কর্তা। আমি দেখেই চিনতে পারলাম। মনে হয় সে-ও চিনতে পারল।

থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তার কর্তা হনহন করে হেঁটে চলেছে। মেয়েটি কিছুটা দ্বিধায়। বরের সঙ্গে সঙ্গে যাবে, নাকি আমার সঙ্গে কথা বলবে! বরের কাছে কী বলে পরিচয় করাবে! আমি কিছুক্ষণ পিছু নিলাম। কিন্তু ডাকার সাহস পেলাম না। কী জানি, কী মনে করবে! যদি অস্বস্তিতে পড়ে যায়! মাঝে প্রায় দু’দশক পেরিয়ে গেছে। সময়ের আয়নায় ধুলো জমে গেছে। তবু পাঁচবছর আগের সেই বইমেলার দুপুরটা বড় বেশি করে মনে পড়ে।

সায়ন্তন দাস, বেলেঘাটা

স্মৃতিটুকু থাক। সেলিব্রিটি নয়, এই বিভাগ হল পাঠকের মুক্তমঞ্চ। ছোট ছোট মন ছুঁয়ে যাওয়া স্মৃতির কথা উঠে আসুক আপনার কলমে। সেই অনুভূতি ভাগ করে নিন অন্যদের সঙ্গে। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

আ কেস স্টাডি অন বাংলা বই বিপণন

অর্ণব চ্যাটার্জি

১৯শে ডিসেম্বর ২০২২
ছয়টা বই অর্ডার দিলাম অনলাইন পোর্টালে। দামের সঙ্গে ₹১০০ ডেলিভারি চার্জও দিলাম। অর্ডার প্লেসের পরে অটোমেটেড মেলও পেলাম যে অর্ডার অ্যাক্সেপ্টেড। মেলে নাম, ঠিকানা, পেমেন্ট ডিটেলস সব রয়েছে। নেই শুধু প্রবাবেল ডেলিভারি ডেট।

যাইহোক, সিস্টেমটা ভালই বানিয়েছে। পেশাদারের মতো বইয়ের ডেলিভারি হবে ধরেই নিয়েছিলাম। অ্যামাজন বাইং এক্সপিরিয়েন্স হবে না, সেই এক্সপেক্টেশনও করি না। কিন্তু ফলো আপ না করেই, সময় মতো বই পাব ভেবে রেখেছিলাম।

২৮শে ডিসেম্বর ২০২২
২৬/২৭ তারিখ থেকে অস্বস্তি শুরু হল। কোনও আপডেটই নেই। নিদেন পক্ষে এক লাইনের মেল আশা করেছিলাম যেখানে অন্তত লেখা থাকবে, তোমার অর্ডার ভুলিনি বস। তাও পেলাম না। ওয়েবসাইটে দেওয়া হোয়াতে পিং করলাম ২৮শে ডিসেম্বর,

আমি : “Hi, good morning. আমি ১৯শে ডিসেম্বর আপনাদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে একটি অর্ডার প্লেস করি। অর্ডার নম্বর **। বইগুলো কবে পাব জানাবেন প্লিজ।”

তেনারা : “অপনার অর্ডার ডিটেইল পাঠান।”

আমি : হুব্বা হয়ে অর্ডার ডিটেইলের ছবি দিলাম।

তেনারা : “** বইটি স্টক না থাকার জন্য পাঠাতে দেরি হচ্ছে। আশা করি আগামী সপ্তাহে পাঠাতে পরবো। নমস্কার।”

আমি : “ধন্যবাদ”

৭ই জানুয়ারি ২০২৩
বিরক্ত আমি আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “এই বইগুলো এ সপ্তাহে পাঠাতে পারলেন?” (অর্ডার ডিটেইলের ছবিসহ)

তেনারা : “আপনার সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা দিন।”

আমি : নাম ঠিকানা দিলাম, মনে মনে বললাম এটা বাংলা বই বিপণন কমিউনিটির চূড়ান্ত আনপ্রফেশনালিজমের একটা ভাল কেস স্টাডি হতে চলেছে।

(কোনও উত্তর পেলাম না)

৯ই জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “বইগুলো কুরিয়ার করেছেন?”

(কোনও উত্তর পেলাম না)

১০ই জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “বইগুলো কবে পাব বলতে পারবেন? ১ মাস তো হতে চলল।”

(কোনও উত্তর পেলাম না)

১১ই জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “বইগুলো কবে পাব বলতে পারবেন? ১ মাস তো হতে চলল।”

(কোনও উত্তর পেলাম না)

১৩ই জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “এটলিস্ট এটাতো বলুন বইগুলো পাব না পাবনা? এত আনপ্রফেশনাল অ্যাটিটিউড কেন আপনাদের।”

তেনারা : “আপনার অর্ডার এর %%%% বই টি আউট অফ স্টক। এখন কলকাতা

বইমেলার জন্য প্রেস খুব ব্যস্ত। সেজন্য পাঠাতে দেরি হচ্ছে। আশাকরি সামনের সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাতে পারবো। নমস্কার।”

২২শে জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “বইগুলো কুরিয়ার করেছেন?”

তেনারা : “আগামীকাল পোস্ট হবে। আপনার বাড়ির লোকেশন বলুন। কালকেই হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে।”

আমি : নাম ঠিকানা দিলাম, মনে মনে বললাম আনপ্রফেশনালিজমে রিডিফাইনড।

২৩শে জানুয়ারি ২০২৩
আবার মেসেজ করলাম।

আমি : “বইগুলো কী আজ ডেসিভার হবে?”

তেনারা : “বিকেল ৪টের মধ্যে ডেলিভারি হবে।”

সমাপ্তি - বইগুলো অবশেষে পেলাম।

কনক্লুশন : কী করে কোনও ব্যাবসা এত আনপ্রফেশনাল হতে পারে? হাজারো সমস্যা আসতে পারে বই পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্তত গ্রাহককে সে ব্যাপারে নিজের থেকে অবগত করা উচিত! বহুকাল আগে এক লালমুখো আমায় একটা আপ্তবাক্য শিখিয়েছিল, “অর্ণব, কমিউনিকেট, কমিউনিকেট অ্যান্ড কমিউনিকেট”। কোনও সমস্যা আসতেই পারে। কিন্তু ক্রেতা ভগবানকে নিজে থেকে জানাতে থেকো, তিনি অবুঝ নন। কিন্তু অবুঝ বইপাড়া সেটা বুঝলো না, বুঝবে না এবং বুঝতে চায় না।

পুনশ্চ : আরও দুটো কথা:
১.কোনও বিশেষ বিক্রেতা বা বিপণনকারীর নাম দিইনি। কারণ, রোগকে ঘৃণা করা উচিত, রোগীকে না। আর এই রোগ সমগ্র বইপাড়াতেই রয়েছে।

২.বই পাওয়ার আগে, ফেবুতে খাপ বসাইনি বা পার্সোনাল কোনও কানেকশন ব্যবহার করিনি, কারণ দেখতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা কতদিন ধরে চলে।

সামাজিক উপন্যাসে পাঠক উদাসীন কেন?

নীলাদ্রি গুপ্ত

একজন পাঠক লিখেছেন তিনি গত বছরে প্রায় তিরিশটি বই পড়েছেন। যে লিস্ট এবং ছবি দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বইগুলির প্রায় সবই সাসপেন্স থ্রিলার, গোয়েন্দা গল্প, ভূতের গল্প অথবা ভারতীয় পুরাণ আশ্রিত গল্প কাহিনী। বর্তমান সমাজ আশ্রিত গল্প বা উপন্যাস প্রায় নেই-ই।

এই প্রবণতা কিন্তু কেবল একজনের নয়, বরং বেশিরভাগেরই। আমি কিন্তু দোষারোপ করার জন্য লিখছি না। পাঠকের যা ইচ্ছা হবে, পছন্দ হবে তা-ই পড়বেন তা নিয়ে কার কী বলার থাকতে পারে।

কিন্তু আমি বুঝতে চাইছি, কেন এমনটা হচ্ছে? পাঠক কেন সামাজিক গল্প উপন্যাসের চেয়ে সাসপেন্স থ্রিলার বা ওই ধরণের লেখার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন? নাকি বর্তমান বঙ্গে ভাল সামাজিক গল্প উপন্যাস লেখা হচ্ছে না?

ইদানীং তো এও দেখতে পাচ্ছি, যে সমস্ত নামী কথাকাররা সামাজিক গল্প উপন্যাস লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরাও সাসপেন্স থ্রিলার লেখায় মনোনিবেশ করছেন।

এ কথা ঠিক, গোয়েন্দা কাহিনি, সাসপেন্স থ্রিলার সেই বহুকাল ধরেই লেখা হচ্ছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ আজও তুমুল জনপ্রিয়, বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় সমেত আরও ছোটদের কাহিনিগুলি, সত্যজিত রায়ের ফেলুদা, প্রোফেসর শঙ্কু। অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তবু বলা চলে মূলধারার লেখার পাশাপাশিই এই লেখাগুলি চলত। মূলধারার গল্প উপন্যাসই পাঠক বেশি পড়তেন।

কিন্তু এখন যেন ব্যাপারটা উল্টে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে পাঠ তালিকা বা উইশ লিস্ট দেখি, তা দেখে এই কথা মনে হল। আমি আবার বলছি, পাঠক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি পড়ুন, লেখকও তাঁর মনোমত বিষয় নিয়ে যত খুশি লিখুন। আমার এ নিয়ে তির্যক কিম্বা সরল কোনও বক্তব্যই নেই। পাঠক যে বই মুখে হচ্ছেন সেটি বাংলা সাহিত্যের বড় পাওনা।

আমার বলার কথা, সামাজিক গল্প উপন্যাস কি অধিকাংশ পাঠককে আর আকর্ষণ করছে না? নাকি লেখাই কম হচ্ছে?

বেঙ্গল টাইমস

INDIA
GATE
2
44th International
KOLKATA BOOK FAIR
29 JANUARY TO 9 FEBRUARY 2020 • Daily 12 PM to 8 PM

বইমেলা সংখ্যা

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in